প্রথম অধ্যায়
উপসমিতি গঠনের প্রাসঙ্গিকতা

পশ্চিমবঙ্গের তিন স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। বিগত পঁচিশ বছরে এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব শুধু যে পরিমাণে বেড়েছে তাই নয়, গ্রামের মানুষের ভাল থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সব দায়িত্ব একটু একটু করে এসেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর।

এই বিশাল কর্মকান্ড যে শুধু প্রধান, উপপ্রধান বা দু-একজন সদস্যের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়, একথাও ভাবা হচ্ছিল অনেক দিন ধরে। এর জন্য চাই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাগ করে নেওয়া যাতে সদস্যরাও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যাতে সদস্যরাও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্মকে আরও গতিশীল করতে পারেন।

- অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
- জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ
- পূর্তকার্য্য ও পরিবহন
- কৃষি, সেচ ও সমবায়
- শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া
- শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ
- বন ও ভূমি সংস্কার
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ
- খাদ্য ও সরবরাহ
- ক্ষুদ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি

এদের বিষয়গুলি সরকারী দপ্তরগুলির বিষয় বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় সরকারের সঙ্গে পঞ্চায়েতের যোগাযোগ পদ্ধতিও সহজ হয়েছে। স্থায়ী সমিতিগুলি আইনী কাঠামোর মধ্যে এবং বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ফলে কর্মে যেমন দক্ষতা ও গতি এসেছে তেমনি বিকেন্দ্রীকরণের নীতিও অনুসৃত হচ্ছে।

কিন্তু নানা কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এতদিন এমন কোন স্থায়ী সমিতি বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়নি। তবে কাজের সুবিধার জন্য পঞ্চায়েত আইনের ৩২ক ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাদের করণীয় কাজগুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত করে সদস্য বিশেষকে অথবা কয়েকজন সদস্যের একটি দলের উপর এক বা একাধিক কর্মগুচ্ছের দায়িত্ব অর্পন করে কাজ করতে বলা হয়েছিল। কিন্ত এ ব্যবস্থায় কিছু অপূর্ণতা ছিল যেমন: -

(ক) এই গুচ্ছ বিভাজন আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল না, ছিল না বিভাজনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও ফলে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বিভাজনের সাধারনীকৃত রূপের নিশ্চয়তা ছিল না।

(খ) সদস্য বিশেষের হাতে কোন কাজের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যস্ত হওয়া গণতান্ত্রিক রীতি বিরুদ্ধ।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত তার ইচ্ছামতো দায়িত্ব প্রাপ্ত দলগুলির পূণর্গঠন করতে পারতো অথবা ন্যস্ত কর্মের পূনর্বিন্যাস করতে পারতো ফলে দলগুলির গঠনমুখী পরিকল্পনা গ্রহণে অনিশ্চয়তার পরিবেশ থাকতো।

(ঘ) ঐ দলগুলির হাতে কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় তার অর্থসংস্থানের ব্যাপারে প্রধানের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

(ঙ) ঐ দলগুলির মিটিং এর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না আইনে। ফলে কোন দল কতগুলি মিটিং করল বা করবে সে বিষয়ে কোন স্থিরতা ছিল না।

বর্তমানে পঞ্চায়েত আইনের ঐ ৩২ক ধারা সংশোধন করে পাঁচটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মতালিকাটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে প্রতি বিভাগকে এক একটি উপসমিতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলি প্রায় জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির আদলে হওয়ায় ঐ ঐ বিষয়গুলি ব্যাপারে তিন স্তরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা হয়েছে। এখন কোন একজন সদস্যের হাতে কোন উপসমিতির দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিধান নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত ইচ্ছা করলেই উপসমিতিগুলির কাঠামো পরিবর্তন করতে পারবে না। ফলে তাদের কর্মপরিকল্পনা ধারাবাহিকতায় অনিশ্চয়তা থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা অন্য উপসমিতিগুলির সঞ্চালকগণ অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির বাধ্যতামূলক সদস্য হওয়ায় অর্থসংস্থান ও বরাদ্দের ব্যাপারে প্রতিটি উপসমিতি সমানাধিকার ভোগ করবে। এটাও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে একটা বিশেষ পদক্ষেপ। এখন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে উপসমিতির পরামর্শ মত অর্থবরাদ্দ করা প্রধানের পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক। এছাড়াও ৩২ক ধারায় গঠিত দলগুলিতে সরকারী আধিকারিক এবং অন্য বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। ফলে ঐ দলগুলির পক্ষে সময়মতো এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ পাবার নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু এখনকার উপসমিতিগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবেই তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে উপসমিতিগুলির কাজকর্মে গতি ও দক্ষতা বাড়বে।

অর্থাৎ একদিকে সরকারের বিশেষজ্ঞ আধিকারিক অন্যদিকে গ্রামের মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই আরও মজবুত হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তি, স্থানীয় উন্নয়ন স্থানীয়ভাবেই করে ফেলা যাবে এবং প্রধান বা উপপ্রধান এতকাল যে দায়িত্ব একক বা যুগ্মভাবে পালন করতেন তা আরও দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে করা যাবে এই দায়িত্ব অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ফলে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই উপসমিতির গঠন ও দায়-দায়িত্বের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপসমিতির গঠন, ক্ষমতা, দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য

আগেই বলা হয়েছে যে, ত্রিস্তর পঞ্চায়তে ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছের সংগঠন হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। এই স্তরে কাজ এবং দায়িত্ব ও ভাগ করে নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আইনে উপসমিতি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট পাঁচটি উপসমিতি থাকবে। এগুলি হোল: (১) অর্থ ও পরিকল্পনা, (২) কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ, (৩) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, (৪) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, (৫) শিল্প ও পরিকাঠামো। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত উপসমিতি গঠন করতে পারে।

উপসমিতির গঠন: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভার (সরকারীভাবে ডাকা) তিন মাসের মধ্যে উপসমিতি গঠন করতে হবে। উপসমিতির সদস্য হবেন-

(১) প্রধান ও উপপ্রধান (পদাধিকার বলে) এবং

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য এবং পদাধিকার বলে সদস্যদের (পঞ্চায়েত সমিতির) মধ্যে থেকে অনাধিক তিনজন।

এই তিনজনকে নির্বাচিত করতে হবে সরকারীভাবে ডাকা একটি সভায়।

তবে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির জন্য কোনো সদস্য নির্বাচিত হবেন না। অন্যান্য উপসমিতির সঞ্চালকরাই অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে, সেই দলের নেতা অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই বা তার বেশী স্বীকৃত জাতীয় দল বা রাজ্য দলের বিরোধী সদস্য সংখ্যা সমান হয় তবে যেক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও রাজ্য দলের যে ক্রমবিন্যাস ঠিক করে দেবেন, তা অনুসরন করে জাতীয় দলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যদি কোনো স্বীকৃত বিরোধী দলের সদস্য না থাকেন সে ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচিত বয়জ্যোষ্ঠ বিরোধী নির্দল সদস্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকারবলে সদস্য হবেন।

এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে রাজ্য সরকার আদেশ করে কোনো উপসমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন।

নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির অর্ধেক সদস্য হবেন মহিলা।

উপসমিতির সদস্য সংখ্যা: -

প্রত্যেক উপসমিতির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হবে এইরকম:

পদাধিকারবলে (পঞ্চায়েত সমিতির) সদস্যসহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা	উপসমিতির সদস্য
(ক) ১০ এবং তার কম	১
(খ) ১১ থেকে ২০	২
(গ) ২১ এবং তার বেশী	৩

প্রধান এবং উপপ্রধান ছাড়া অপর কোনো সদস্য একসাথে দুটির বেশী উপসমিতির সদস্য হবেন না।

সঞ্চালক: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য একজন সঞ্চালক নির্বাচিত হবেন। উপসমিতির সদস্য নির্বাচনের এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি বাদে অন্যান্য উপসমিতির সদস্যরা (কোন নির্বাচিত) একটি সভায় (সরকারীভাবে ডাকা) নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সঞ্চালক নির্বাচিত করবেন।

প্রধান, অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি এবং অপর যে কোনো একটি উপসমিতি ছাড়া অনো কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হবেন না।

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির সঞ্চালক হবেন একজন মহিলা।

সঞ্চালক অথবা সদস্যের পদত্যাগ: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্য লিখিতভাবে প্রধানের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারেন। ঐ পদত্যাগপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় গৃহীত হলে ঐ উপসমিতির সঞ্চালকের পদ শূণ্য হবে।

আকস্মিক শূন্যতা: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্যপদে পদত্যাগ। মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে শূন্যতা দেখা দিলে ঐ উপসমিতির সদস্যরা প্রথম উপসমিতি গঠনের বা সঞ্চালক নির্বাচনের নিয়মেই ঐ শূন্যপদ পূরণ করবেন। যিনি এইভাবে এইভাবে নির্বাচিত হবেন, তিনি পঞ্চায়েতের কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করবেন।

উপসমিতির ক্ষমতা: -

প্রত্যেক উপসমিতি তার নিজস্ব বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটের সীমার মধ্যে প্রকল্প প্রনয়ন ও রূপায়ন করবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে দায়িত্ব দেবে উপসমিতি ঐ সেই দায়িত্ব পালন করবে।

এই কাজ করতে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে উপসমিতির যে আর্থিক সীমা নির্দিষ্ট করবেন উপসমিতিকে সেই সীমার মধ্যেই প্রকল্প বা কাজকর্ম রূপায়ন করতে হবে।

প্রত্যেক উপসমিতি তার আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূত প্রতিটি খরচের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের আছে সুপারিশ সহ দাখিল করবে এবং এক্ষেত্রে উপসমিতির দায়িত্ব হবে সেই সকল বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত মেনে কর্মসূচী রূপায়ন করা।

কর্মসূচী রূপায়নের আগে প্রত্যেক উপসমিতি অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির আর্থিক অনুমোদন নেবে।

কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে বাজেট বরাদ্দ করবে, উপসমিতি সেই বাজেট বরাদ্দ কোনো ভাবেই পরিবর্তন করতে পারবেন না।

উপসমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য: -

যখন রাজ্য সরকারের কোনো বিভাগ অথবা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কোনো কর্মসূচী রূপায়ন করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়নের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রনয়নের দায়িত্ব দেবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে কিভাবে ঐ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে উপসমিতি সেই নির্দেশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে প্রকল্প ও প্রাককলন প্রস্তুত করে কর্মসূচী রূপায়ন করবে।

উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক

উপসমিতির নাম	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক
অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, রাজস্ব পরিদর্শক।
কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ সহায়ক, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক, মহিলা স্বাস্থ্য সহায়ক, সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক, গ্রাম শিক্ষা সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য), শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পরিচালন সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য), গ্রামীণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহকারী ধাত্রী সেবিকা (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঘ) নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা (আমন্ত্রিত সদস্য) সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঙ) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক বা নির্মাণ সহায়ক, রাজস্ব পরিদর্শক।

উপসমিতির সচিব: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মচারী উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিভিন্ন উপসমিতির সচিব নির্দিষ্ট করতে হবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবই অর্থ ও পরিকল্পনা এবং যে উপসমিতির সচিবের পদ শূন্য হবে সেই উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

উপসমিতি যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করবে

উপসমিতি	বিষয়
অর্থ ও পরিকল্পনা	অর্থ, বাজেট, হিসাব নিরীক্ষা, কর, সম্পদ সংগ্রহ, সংস্থা, অফিস পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রনয়ন, বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ন ও তদারকি, পরিকল্পনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ ও তথ্যভান্ডার প্রস্তুত, দুর্যোগ মোকাবিলা, হাট, বাজার, ফেরী পরিচালনা, অন্যান্য উপসমিতির কাজের সমন্বয় এবং অন্যান্য কাজ যা অন্য কোনো উপসমিতিকে দেওয়া হয়নি।
কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ	কৃষি, সব্জি ও ফলচাষ, সেচ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য, দলবিভাজিকা উন্নয়ন, সমবায়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য	সাক্ষরতা প্রচার ও প্রসার, শিশুশিক্ষা কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচী, জনশিক্ষা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রামীণ ডিসপেনসারি ও ক্লিনিক পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী।
নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ	স্বনির্ভর দল, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্প।
শিল্প ও পরিকাঠামো	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক ও গৃহনির্মাণ।

তৃতীয় অধ্যায়
উপসমিতির সভা

উপসমিতির সভাগুলি হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ে। প্রতি দুই মাস অন্ততঃ একটি সভা ডাকতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে উপসমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানকে জানিয়ে রেখে একাধিক সভাও করা যেতে পারে। সভার তারিখ এবং সময় ঠিক করবেন সঞ্চালক।

যদি কোনো কারণে সঞ্চালক সভা ডাকতে না পারেন তবে প্রধান সেই উপসমিতির সভা ডাকবেন। কিন্তু প্রধান পরপর তিনটির বেশী সভা ডাকতে পারবেন না।

সভার আলোচ্য সূচী: - সঞ্চালকের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সভার আলোচ্যসূচী ঠিক করবেন। প্রয়োজনে সঞ্চালক লিখিতভাবেও এ বিষয়ে সচিবকে নির্দেশ দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে প্রত্যেক সভারই প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পর্য্যালোচনা করা।

সভার নোটিশ: -

সভার দিনক্ষণ, আলোচ্যসূচী সম্বলিত নোটিশ স্বাক্ষর করবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সচিব এবং তা বার্তাবহ অর্থাৎ পঞ্চায়েত কর্মীদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভার নোটিশ বিলি করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। সভার নোটিশের একটি কপি গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশবোর্ডেও ঝুলিয়ে দিতে হবে, যে তারিখে নোটিশটি স্বাক্ষর করা হচ্ছে সেই তারিখেই।

সাধারনভাবে সাতদিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে হবে। তবে জরুরী সভা তিন দিনের নোটিশে ডাকা যাবে। জরুরী সভায় একটি বিষয়ই আলোচ্যসূচী হিসাবে রাখা যাবে।

কোরাম: -

নির্বাচিত অন্ততঃ দুইজন সদস্য উপস্থিত থাকলে তবেই সভার কোরাম হবে এবং সভার কাজ শুরু করা যাবে।

সভা কখন মূলতবী হবে: -

প্রধানতঃ দুটি কারণে সভা মূলতবী হতে পারে। প্রথমতঃ যদি দেখা যায় যে কোনো একজন সদস্য সভার নোটিশ পাননি, এবং দ্বিতীয়তঃ সভা শুরুর নির্দ্ধারিত সময়ের আধঘন্টা পরেও কোরাম না হয়।

ঐ সভা সাতদিন পরে আর একটি তারিখ এবং সময়ে (যা সঞ্চালক স্থির করে দেবেন) একই স্থানে একই আলোচ্যসূচী নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সভার সভাপতি: -

উপসমিতির সব সভাতেই সভাপতিত্ব করবেন সঞ্চালক। কোনো কারণে তিনি উপস্থিত না থাকলে অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করবেন।

সভার হাজিরা বই: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য সভার একটি হাজিরা বই রাখতে হবে। এই হাজিরা বইতে সকল সদস্যই স্বাক্ষর করবেন বা বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলের টিপ দেবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী: -

সভার কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে এই উদ্দেশ্যে রাখা একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে এবং সভা শেষ হবার আগেই তা উপস্থিত সকলকে পড়ে কেনাতে হবে। সবশেষে সভার সভাপতি সেই কার্য্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী লিখবেন উপসমিতির সচিব অথবা পঞ্চায়েতের সচিব তাদের কেউ না থাকলে সঞ্চালকের নির্দেশ অনুযায়ী অপর কোনো কর্মচারী কিংবা সংশ্লিষ্ট উপসমিতির কোনো সদস্য এই দায়িত্ব পালন করবেন।

কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে বাংলা ভাষায়। পার্থক্য এলাকায় নেপালী ভাষাতেও লেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি: -

আলোচ্য বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ/বা দ্বিমত থাকলে সেই বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে।

উপসমিতির সভার হাজিরা খাতার নিদর্শ

(১) সভার তারিখ______________________________

(২) সভার স্থান______________________________

(৩) সভার সময়______________________________

(৪)কি ধরনের সভা ______________________সাধারন/ বিশেষ/ জরুরী

সদস্যদের নাম	সদস্যের স্বাক্ষর /টিপসই	উপস্থিত হবার সময়	যার দ্বার প্রত্যয়িত (নিরক্ষর সদস্যের ক্ষেত্রে)

- অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিন।

উপসমিতির সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

....উপসমিতি

প্রতি

____

____

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী______________________তারিখে সকাল/ বিকাল________________ টার সময় ______________________(স্থান) -এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) ______________________

(২) ______________________

(৩) ______________________

সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

উপসমিতির জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

....উপসমিতি

প্রতি

____

____

মাননীয়,

নিম্নলিখিত বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী_______________________তারিখ সকাল/ বিকাল______________________টার সময়______________________________(স্থান)-এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) ______________________________

তারিখ:

সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

পঞ্চম অধ্যায়
কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ৩২ ক ধারা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে যে পাঁচটি উপসমিতি গঠনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কারণ, আমাদের দেশ প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৭২শতাংশের বেশি জনসমষ্টি গ্রামীণ এলাকায় বাস করেন। কৃষি নির্ভর শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ এলাকাকে কেন্দ্র করে যে কৃষি কর্মযজ্ঞ চলছে, প্রাণী সম্পদ বিকাশও তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এছাড়া আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ (প্রায় ৬৩শতাংশ) কৃষি থেকেই আসে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনার একটা বড় অংশ কৃষি উন্নয়ন, কৃষি শিল্পের বিকাশ, ভূমি সংরক্ষণ, সেচ, জলাধার পরিচালনা, জল বিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়ন। মৎস্য চাষ ও অন্যান্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে গঠিত।

উপসমিতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ: -

গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় উপাদান হল কৃষি। গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবিকাকে সচল রাখতে কৃষির পরেই যার স্থান - সেটি হল প্রাণী সম্পদের বিকাশজনিত কর্মকান্ড যেমন পশুপালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতি। এই সমস্ত কর্মকান্ডগুলি এলাকার ভূমি ও জল সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই যে বিষয়গুলি এই উপসমিতির আওতায় পরে সেগুলি হল (১) কৃষি সংক্রান্ত বিষয়, (২) কৃষিজাত দ্রব্য নির্ভর শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা, (৩) ফলমূলের বাগান উন্নয়ন, (৪) সেচ ব্যবস্থা, জলাধার পরিচালনা, (৫) জল সংরক্ষণ, (৬) জলবিভাজিকা উন্নয়ন, (৭) প্রাণীসম্পদ বিকাশ, (৮) মৎস্য চাষ (৯) সমবায়, (১০) ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (প্রফলাল), (১১) কৃষি ঋণ ও কৃষি পেনসন, (১২) কৃষি পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা, (১৩) ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমিক্ষয় নিবারন, (১৪) মৃত্তিকা ও জল সম্পদের গুণগতমান বজায় রাখা, (১৫) কৃষিবন, চারণ ক্ষেত্র ও তৃণভূমি উন্নয়ন, (১৬) জৈব সার উৎপাদন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে কৃষি, স্বাস্থ্যরক্ষণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর যোগসাধন। সর্বোপরি টেকসই কৃষিব্যবস্থার জন্য ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীনদের সম্পদে অধিকার অর্পণ।

কৃষি উন্নয়নের পটভূমি: -

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর। [মৃত্তিকা জননীকে চিন্তাভাবনা ও যত্নের সঙ্গে ব্যবহার তত্ত্বাবধানের জন্য তখন দেশের রাজাকে ''ভূমিপাল'' (ভূমির জিম্বাদার/তত্ত্বাবধায়ক) আখ্যা দেওয়া হত। জমির মাটির ভাল গুণগত মানের উপর উন্নত কৃষিকাজ ও সুন্দর জীবন গড়ে ওঠে। কৃষির উন্নতিসাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পঞ্চায়েতের পক্ষে তাই একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্র। সেচের সুবিধা সৃষ্টি করা, অধিক ফলনশীল ধান চাষে উৎসাহ দেওয়া, শস্য পর্যায় স্থির করা, চাষের নিবিড়তা বাড়ানো, বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়ন, কৃষির উপকরণ ও কৃষি-পণ্যের বিপনন ব্যবস্থা, কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, কৃষককে উৎপাদনভিত্তিক ঋণ পেতে সাহায্য করা প্রভৃতি বিষয়গুলি এই গ্রাম পঞ্চায়েত তথা কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রাজ্যে মোট জোতের প্রায় ৯০শতাংশ এবং চাষের জমির প্রায় ৬৪শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর মালিকানাধীন। এই ছোট জোতের উপর জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী। কৃষির উন্নয়নে এই গোষ্ঠীর লোকজনদের সার্বিক অংশগ্রহণ খুব জরুরী। কারণ কৃষির বাইরে গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগও কম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে ছোট জোতকেও লাভজনক করা যায়। প্রযুক্তির বিকেন্দ্রীকরণ এমন হওয়া উচিত যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারনের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে। পশ্চিমী ধাঁচের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঠিক এর বিপরীত, কারণ যেখানে সম্পদ ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ হয় শিল্পের দ্বারা। ভূমি সংস্কারের পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবাংলায় ছোট জোতের উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এখন বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তির সঠিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে সাধারন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের নিছক দর্শকের ভূমিকা থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণের ভূমিকায় আনতে হবে। কৃষিপ্রযুক্তির বিকেন্দ্রীকরণ যেমন সামাজিক সংগঠনকে প্রভাবিত করে; তেমনি সামাজিক সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিতও হয়। তাই কৃষি এবং গ্রামীণ প্রগতির ধারায় নিছক অর্থনৈতিক প্রভাবের বাইরে সামাজিক প্রভাবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কৃষির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন অনিবার্য। কৃষি অর্থনৈতিক প্রগতি এবং সাবেকী সমাজ সংগঠন, পরিবার প্রভৃতি সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মিশলে আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা রূপায়ণের দিক থেকেও তা অতীব বাস্তব।

পশ্চিমবাংলায় চাষযোগ্য জমির ব্যবহার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই একই জমিতে একাধিক ফসল তুলতে না পারলে জমি বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানো আর সম্ভব নয়। এই রাজ্যে ছোট জোত এবং প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় চাষের উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক, ফলে চাষের জমির সিংহভাগ (৭৯শতাংশ) খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। খাদ্যশস্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী এলাকা ধান চাষের কাজে লাগছে। গম চাষের এলাকা বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও গমের চাষ আশানুরূপ বাড়ছে না। ডাল জাতীয় শস্য চাষের এলাকা কমছে। রাজ্যের প্রয়োজনের ৩০শতাংশের বেশী ডাল জাতীয় শস্য এখানে উৎপাদিত হচ্ছে না। ডাল জাতীয় শস্যের বাকিটা অন্য রাজ্যগুলি থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। ডাল জাতীয় শস্য যেখানে উৎকৃষ্ট প্রোটিন হিসাবে পরিচিত, তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে অধরা থেকে যাচ্ছে। বাজার ও দামের উপর নির্ভর করে বলে পাট, আখ ও আলু চাষ এ রাজ্যে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। অধিক ফলনশীল ফসলের (ধান, গম) চাষ ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ছে। রাজ্যে রাসায়নিক সার (এন.পি.কে - নাইট্রোজেন, ফসফরাস পটাশ) গত পাঁচ বছরে হেক্টর প্রতি ১০৬ কিগ্রা থেকে বেড়ে ১৪৫ কিগ্রাতে পৌঁছেছে।

ভূমি সংস্কারের ফলে এ রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ছোট জোতে উৎপাদন বৃদ্ধির যে সাফল্য দেখিয়েছেন তা আমাদের দেশে একটি মডেল হিসাবে পরিগণিত কিন্তু এখনও গম, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনে আমাদের সম্ভাবনার পূর্ণবিকাশ ঘটে নি। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির গতিবেগ ও সমান নয়। যে সব এলাকায় সেচের সুবিধা আছে সেখানে উন্নয়ন তাড়াতাড়ি হয়েছে। একই জেলায় দুটি অংশে অগ্রগতির চিত্র বিপরীত। খরাপ্রবণ ও বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় এখনও এ ধরনের সাফল্য আসেনি। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় জাতীয় জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচি ১৯৯১-৯২ সাল থেকে সারা দেশে চালু হয়েছে।

তাই দেখা যাচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পরিবেশের প্রধান উপাদান জল ও মাটির উপর। মাটির গঠন ও প্রকৃতি। মাটির উর্বরা শক্তির সংরক্ষণ, ভূমিক্ষয়রোধ, জল সম্পদের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ভরশীল। তাই এগুলির ধারণা ও সমস্যা সমাধানের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দরকার।

মাটির অপুষ্টি ও অনুর্বরতার প্রধান কারণগুলি হল (১) দ্রুত ভূমিক্ষয়, (২) জৈব সারের পরিবর্তে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, (৩) সঠিক পদ্ধতি না মেনে চাষবাস, (৪) যথোচিত জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাব, (৫) নগরায়ন ও জলবসতির প্রসারের ফলে জমির সঙ্কোচন, (৬) অনিয়ন্ত্রিতভাবে বর্জ্য পদার্থ জিনিষ জমিতে ফেলা, (৭) অম্লত্ব বা ক্ষারের মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়া।

জলসম্পদের সদ্ব্যবহার: -

বৃষ্টির জল মাটি চুঁইয়ে ভূ-গর্ভ স্তরে প্রবেশের আগেই আচ্ছাদনহীন জমির ঢাল নালা-খাল-উপনদী-নদী বেয়ে গড়িয়ে যায়। দেখা গেছে, বৃষ্টির জলের স্রোতের বেগ দ্বিগু ণ হলে তার বহন ক্ষমতা চারগুন এবং স্রোতের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া মাটি, কাঁকড় পাথর কণিকার ওজন ষোলগুণ হলেও স্বচ্ছন্দে জলস্রোতের সঙ্গে অন্যত্র চলে যায়। বৃষ্টির এই ছুট জল শুধু গড়িয়ে যায় না, সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায় অতি মূল্যবান মাটি, যা নদীখাতে পলি হিসাবে জমে নদীর জল নিকাশি ক্ষমতা হ্রাস করে এবং বার বার বন্যার কারণ হয়। এইভাবে খরাপ্রবণ এলাকার ভূমিক্ষয় ও ছুটজল দ্বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে - উপর অববাহিকা অঞ্চলে সম্পদের বিনাশ এবং নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি করে সম্পদ বিনাশ ও অন্যান্য ক্ষতিসাধন।

বৃষ্টিপাত ও তার কারণে জলপ্রবাহের দ্বারা দলের উপর থেকে নীচের দিকে বয়ে যাওয়া - কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক ভূখন্ড যেমন ভূমিঢাল, মাটির তলার শিলার গঠন ও কাঠিন্যের তারতম্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। একটি সাধারণ অংশ বা নীচু জায়গা দিয়ে কোন নির্দিষ্ট এলাকার বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য জল বয়ে নীচে চলে যায়। ঐ নির্দিষ্ট এলাকাটিকে জলবিভাজিকা (ওয়াটার শেড) বলে। জল নিকাশীর অবস্থানদেখে কোন নির্দিষ্ট বা আলাদা আলাদা জলবিভাজিকা শনাক্ত করা যায়। এটা কোন প্রশাসনিক এলাকায় সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রাকৃতিক ভূখন্ড একক নিয়ে গঠিত। সমগ্র অঞ্চলটির মাটির তলায় সংগৃহীত জলধারক রূপে ওয়াটার শেডের আকার বিভিন্ন হয়। ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা ১০১ থেকে ১০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে তৈরি হয়। মিনি ওয়াটার শেড ১০০ হেক্টরের কাছাকাছি পর্যন্ত হয়। মাটির পরিবেশে কোন এলাকাতে সর্বাধিক জল পাওয়ার অবস্থাটা মাটির ক্ষয়, অধঃক্ষিপ্ত হয়ে পলি পড়া, গাছপালার উপযোগী খাবারের স্তরের মাটি হ্রাস, গাছপালা আচ্ছাদন হ্রাস প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তাই জলের সাহায্য নিয়ে কোন এলাকার মাটির উৎপাদন ক্ষমতা ও তার নিয়ন্ত্রণ বা ঐ এলাকার জল ব্যবস্থাপনা যেমন বৃষ্টির জল ঐ এলাকাতে আটকে রাখাব ব্যবস্থা করতে পারলে মাটি সরস থাকে। ফলে ফসল উৎপাদনও ভাল হয়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে এলাকার কৃষিকাজজনিত উন্নয়ন ঘটাতে হলে এই জল বিভাজিকার এলাকা ধরে উন্নয়নমূল কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। গ্রামাঞ্চলের জলবিভাজিকাভিত্তিক এলাকাগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে কাজের জন্য যৌথ কমিটি গঠন করতে পারে (ধারা, ৩০ পঞ্চায়েত আইন এবং বিধি ২৫, ২৬ পঞ্চায়েতে প্রশাসন বিধি, ১৯৮১)। এছাড়া একই গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামসংসদের এলাকা জুড়ে জলবিভাজিকা গঠিত হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে জলবিভাজিকা উন্নয়নের কাজটি সমন্বিত করতে পারে।

জলবিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করলে মাটির তলায় জলস্তরের উন্নতি হবে। উপরের মাটি সরস থাকবে এবং কূপ, নালা, পুকুর প্রভৃতি জলরাশি ধরে রাখতে পারবে। পানীয় জল পাওয়ার অবস্থা বাড়বে, কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। গৃহপালিত পশুদের জন্য তৃণভূমির পরিমাণ বাড়বে। জ্বালানী কাঠ যোগানের ক্ষমতা পরিবেশের বেড়ে যাবে। এলাকার জৈব বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে। পতিত জমি উদ্ধার করে চাষযোগ্য করা যাবে। সর্বোপরি একটি সংস্থা (ওয়াটার শেড টিম) তৈরী হবে, যেখানে এলাকার জনগণ একসঙ্গে হাত মিলিয়ে জল বিভাজিকার ব্যবস্থাপনা করতে পারবে। এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। [ধারা ২০ (১) (ঘ) (ঙ) (ঞ) (ট) (ঠ)]

জলবিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়নের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েত/উপসমিতির করণীয় কাজকর্ম: -

ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা পরিচর্যা ও উন্নয়নের জন্য আবাদী ও অনাবাদী জমি, পতিত জমি, নিকাশী নালা, নষ্ট হওয়া বনভূমি, সরকারি/গোষ্ঠী/ মালিকানাধীন/ ব্যক্তিগত জমিতে -স্বল্প ব্যয়ে, সহজ প্রযুক্তি এবং সহজে ব্যবহার ও সংরক্ষণ যোগ্য কাজকর্মগুলি নিম্নরূপ-

উদ্দেশ্য	মূল কাজকর্মের বিবরণ
(১) ভূমি ও মাটির রস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জমির উন্নতি ঘটানো।	➢ এলাকার জমির উঁচুজায়গা ধরে ধরে বাঁধ (কন্টুর বাঁধ) অথবা এলাকা ভাগ ভাগ করে বাঁধ (গ্রেডেড্ বাঁধ) তৈরি ও মেরামত ➢ ঐ উঁচু বাঁধ এলাকা ধরে ছোট ছোট গাছপালার আচ্ছাদন। ➢ বোল্টার বাঁধ, মাটির বাঁধ, গাছপালা লাগানো, নিকাশীনালার ধারে ধারে মাটির ক্ষয় আটকাতে ছোট ছোট গাছ, ঘাসের আচ্ছাদন তৈরি করা। ➢ এম.জি.আর.ওয়াই কর্মসূচীর আওতায় মাটি সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য প্রকল্প।
(২) জল সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা	➢ কম খরচে পুকুর, ডোবা, নালা, খাল, কাঁচা কুয়ো, নালা বাঁধ, চেক বাঁধ, চোয়ানো বাঁধ, বৃষ্টি জল প্রবাহের নির্গম নালির পাশে পাশে মাটি সংরক্ষণে র জন্য পলি আটক পুকুর (ডিটেনসন পন্ড) তৈরি বা সংস্কার। জলাধার তৈরি, পলি ধরে রাখার বাঁধ তৈরি।
(৩)সবুজ আচ্ছাদনের/ সবুজা-য়নের জন্য ব্যবস্থা	➢ চারাগাছের নার্সারি তৈরি (জ্বালানী কাঠ, পশুখাদ্য, ফলের গাছ আসবার কাঠ ইত্যাদির জন্য) ➢ বাঁধ, নালা, পুকুর পাড়, পতিত জমি, জমির উঁচু আল, ঘাসজমি, খালের পাশে পড়ে থাকা জমিতে উপযোগী গাছ লাগানো। পুকুর পাড়ে সুবাবুল গাছ বেশি পরিমাণে লাগানো যাতে গাছের পাতা ও কচিডাল পুকুরের জলে মাছের খাদ্য বাড়াতে পারে। জমির চওড়া আল থাকলে তাতে অড়হর জাতীয় ডালশস্য চাষ। ➢ বনসৃজন, কৃষিবন, সামাজিক, বনসৃজন, খামার বন, উদ্যান পালন।
৪) কৃষির উন্নতির জন্য ব্যবস্থা	➢ ব্যক্তিগত/গোষ্ঠীগত/সরকারি জমিতে শস্য প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরি।
৫) প্রানীসম্পদ বিকাশের জন্য ব্যবস্থা	➢ চারণভূমির উন্নয়ন, ঘাস চাষ, সবুজ গোখাদ্য উৎপাদনের প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি। গাছ ও ঘাস একসঙ্গে মিশিয়ে চাষ করলে তাকে কৃষিবন-চারণক্ষেত্র চাষ বা সিলভি পাশ্চর বলে। কৃষির সঙ্গে এইভাবে সম্বন্বয় ঘটাতে পারলে যৌথক্রিয়ার ফলে সুফল দ্বিগুনের বদলে চারগুন হতে পারে।
(৬) মৎস্য চাষের উন্নতি ঘটানো	➢ পুকুর সংস্কার, মৎস্য চাষের প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরি করে তাতে জলের অম্লত্ব/ ক্ষারত্ব সংশোধনের জন্য চুন প্রয়োগের ব্যবস্থা সহ মৎস্যচাষ।
(৭) গোষ্ঠী ও সমষ্ঠিগত সম্পদের উন্নয়ন	➢ সর্বসাধারনের ব্যবহার্য সম্পদ যেমন পুকুর, খাসপুকুর, বাঁধ, জলাধার, চারণভূমি ইত্যাদির উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন।
(৮) দরিদ্র পরিবারের লোকজনদের রুজিরোজগার বাড়ানোর ব্যবস্থা	➢ স্বনির্ভর দল তৈরি ও জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচীতে ঋণ সহায়তা দেওয়া - যাতে দলের উদ্যোগে চারাগাছের নার্শারি, কৃষিবন, ফলবাগান ইত্যাদি করা যায়। ➢ কর্মহীন মরশুমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমজীবি মানুষের জন্য জলবিভাজিকামূলক কর্মসূচীতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

ভূমি সংস্কারকে সামনে রেখে রাজ্যের বিকল্প কৃষিনীতি ও কৃষির অগ্রগতি: - কৃষিতে সমান প্রতিযোগিতার দিকে পদক্ষেপ এবং উৎপাদন কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির মূল ভিত্তি হল ভূমি-সংস্কার। তাই আমাদের রাজ্যে ভূমিসংস্কারের ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। ভূমি- সংস্কারের ক্ষেত্রে , সমগ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান এখন সর্বপ্রথম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য (১৯৯২) অনুযায়ী, যেখানে সারা দেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর হাতে এসেছে মাত্র ৩৪শতাংশ মালিকানা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কারের ফলে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর হাতে এসেছে প্রায় ৭১শতাংশ মালিকানা। এ রাজ্যে মোট বন্টিত কৃষি জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০.৭৩লক্ষ একর। যার থেকে উপকৃত হয়েছেন ২৭.২৬লক্ষ কৃষক। নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫লক্ষ। সামগ্রিক ফল হিসাবে এখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন ৬০ শতাংশের বেশি পরিবার। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সর্বাধিক উপকৃত করতে হলে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ত জরুরী। অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকায় মাটির উপরে জলধারণ বাড়ানোর কর্মসূচী যেমন পুকুর, খাল, জলাধার তৈরি বা সংস্কার, কোন কোন জমির মধ্যেই খাল খনন করে জল ধরে রাখা ইত্যাদির প্রসার ঘটানোর জন্য কৃষি ও প্রানীসম্পদ বিকাশ উপসমিতিকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে।

মিশ্র ফসলের চাষ: - কোন জমিতে এক ধরনের ফসল লাগালে, তাকে বলি ‘একক চাষ’। একই জমিতে একসঙ্গে একাধিক ফসল চাষের নাম মিশ্র ফসলের চাষ। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াবার আশা কম থাকাই এই ধরনের চাষ করে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। মিশ্রচাষ নানা রকমের হতে পারে। যেমন বেগুনে জমিতে পালং, মুলো বা লাল শাক লাগানো। ফলে জমির খালি জায়গা (যাতে আগাছা জন্মায়) এবং অব্যবহৃত সেচের জল ও সার কাজে লাগিয়ে উপরি উৎপাদন হয়। আর এক ধরনের মিশ্রচাষ হল, আলুর ফসলে জায়গায় জায়গায় মাচা করে পটল, মিষ্টি কুমড়ো লাগিয়ে দেওয়া। শীতে এই গাছগুলি বেশি বাড়ে না, তাই আলুর সঙ্গে জায়গা, রোদ বা খাবার নিয়ে প্রতিযোগিতাও করে না। সৌরশক্তিকে একই জমির উপর যত বেশি সম্ভব কাজে লাগিয়ে এই ধরনের চাষকে ‘বহুতল চাষ’-এ রূপান্তরিত করা যায়।

সমন্বিত কৃষি পদ্ধতি: - উদ্ভিদ ও প্রানীর সমন্বয়ে যে কৃষি তারি নাম সমন্বিত কৃষি। মূল কৃষির সঙ্গে মাছচাষ, মৌমাছি পালন, কেঁচোসার তৈরি, জমির আল বা পুকুরের ধারে সুবাবুল গাছ (যার ডালসহ পাতা উচ্চ নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ) লাগানো ইত্যাদি। সমন্বিত কৃষির সুবিধা অনেক। যেমন সরষে ফসলের জমির সঙ্গে মৌমাছি পালন করলে, মৌমাছিরা ফুলের পরাগ মিলন দ্রুতহারে ঘটায়, ফলে ফলন ভাল হয়। গরুর খাদ্য হিসাবে চায় ঘাস, বিচালি, কুঁড়ো, ভুসি - যা ফসলের অবশিষ্ট বা ফেলে দেওয়া অংশ থেকেই জোগাড়ের ব্যবস্থা করা যাবে। শুকনো লতাপাতা ও অকেজো খড়ের সঙ্গে গোমূত্র দিয়ে তৈরি হবে কম্পোট যার। গোবর থেকে জৈব গ্যাস প্লান্টে তৈরি হবে জৈব গ্যাস (গ্যাসে রান্না হবে, আলো জ্বলতে পারে, বাঁচবে জ্বালানি)।ঐ প্লান্ট থেকে যে আধাতরল পদার্থ বা ক্লেদ বেরিয়ে আসে তা অতি উত্তম সার, যাতে সাধারন গোবর সার অপেক্ষা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। সেই সার দিয়ে চাষ হবে। এই সার পুকুরে দিলেও জলের উর্বরতা বাড়বে, তৈরি হবে প্রানীকনা ও উদ্ভিদকনা - যা মাছের খাদ্য। তাই মাছের উৎপাদন বাড়বে।

শস্যক্রমের পরিবর্তন: - একই জমিতে পর পর বিভিন্ন ফসল চাষকে ফসলচক্র বা শস্য পর্যায় বলে। এই ফসল বদলের/বাছাই এর কতকগুলো নিয়ম আছে - (১) নতুন ফসল এক গোত্রের হলে চলবে না। শুঁটি জাতীয় ডালশস্যের পর বাঁধাকপি, পালং চাষ (২) অশিম্বী গোত্রের পর শুঁটি জাতীয় ফসল চাষ (৩) অধিক সার গ্রহণকারী ফসলের পর অল্প সার লাগে এমন ফসল - আলুর পর তিল, ঢ্যাড়স ইত্যাদি।

কৃষিতে সার কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার: -

উদ্ভিদের/শস্য ফসলের গাছগুলির মূল তিনটি খাদ্য উপাদান - নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ এর প্রায় সবটাই সরবরাহ করা হচ্ছে রাসায়নিক সারের মাধ্যমে। জমিতে যত অ্যামনিয়াম সালফেট (নাইট্রোজেন সার) দেওয়া হয় তার অর্ধেকটা প্রায় ৫০ শতাংশ হয় জল ধুয়ে জমি থেকে বেরিয়ে যায়, না হয় এমন আবস্থায় রূপান্তরিত হয় যা ফসলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ফসফরাস সারের অপচয় আরও বেশি। এই অজৈব উপাদানগুলি জলের সঙ্গে মিশে মানুষের শরীরে চলে আসছে, তৈরি হচ্ছে নানা শারীরিক সমস্যা। রাসায়নিক সারের বিকল্প হল জৈব সার। জৈবসারে ঐ তিনটি মূল খাদ্য উপাদান ছাড়া থাকে ক্যালসিয়াম, গন্ধক, তামা লোহা প্রভৃতি মিশ্রিত স্থূল ও অনুখাদ্য, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফুল ফল উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক। যাবতীয় জৈব পদার্থকে কৃষিক্ষেত্রে ফেরত আনতে পারলে সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু সেটা বাস্তবে সম্ভব নয় বলে অভাব পূরণের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। সারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, জৈব সার ও জীবানুসারের পরিপূরক ব্যবহারের প্রতি

বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। সঠিকভাবে রাসায়নিক সারের সঙ্গে জৈব ও জীবানুসারের ব্যবহারে ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের রাজের বিকল্প কৃষিনীতি অনুসরণ করে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি নেওয়া দরকার, সেগুলি নিম্নরূপ: -

ফসল লাগানোর পদ্ধতি	মাটি ও জল	বীজ ও বংশবিস্তার	সার, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার	কীট নিয়ন্ত্রণ	মন্তব্য
১. মিশ্রফসল ও মিশ্র ফসলের চাষ ২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর মিলিত উপায়ে সমন্বিত কৃষি - যেমন সরষে, ধান, মাছ, মৌমাছি	১. মাটি ও জলের সাধারন ধর্ম বা গুণ অম্লত্ব/ক্ষারত্ব পরীক্ষা ও মান বজায় রাখা। ২. আল বাঁধা।	১. শস্যক্রমের সঙ্গে উন্নত বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। ২.উন্নত বীজ উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তির ভারসাম্য-মূলক প্রয়োগ।	১. সঠিক সারগাদা। ২. কম্পোস্ট সার।	১. রাসায়নিক কীটনাশকের সঙ্গে সামান্য নিমতেল মেশানো (১লিটার ৫মিলি নিমতেল)। ২. সেপ্র করার জন্য কীটনাশক সাবান জলে মেশানো, যাতে কীটনাশক তেল কম লাগে।	
৩. শস্যক্রমের পরিবর্তন ৪. বহুতল চাষ ৫. জৈব নিবিড় বাগান ৬. জীবন্ত বেড়া ৭. উঁচু বেড ৮. উঁচু জমি ও নীচু জমির সঙ্গে তাল বজার রেখে (ক) মিশ্র ফসল ও পশুপালন (খ) বাড়ির সবজি বাগান (গ) ফলের বাগান (ঘ) জলাশয় খনন (ঙ) মিশ্র ফসল ও গাছ চাষ।	৩. ঢালে আড়াআড়ি গাছ লাগানো। ৪.ফসলের আচ্ছাদন (মালচ) - লতানে গাছ দিয়ে মাটি আচ্ছাদন, যাতে মাটি সরস থাকে, আগাছা দমন হয়।	৩. নার্সারি। ৪. কলম উৎপাদন।	৩. কেঁচো কম্পোস্ট। ৪. সবুজ পাতা সার। ৫. সবুজ সার। ৬. আলে ও ঢালে গাছ লাগানো। ৭. জৈব সার যেমন রাইজোবিয়াম, নীল সবুজ শ্যাওলা। ৮. রাসায়নিক সার জৈব সার ও জীবাণুসারের পরিপূরক ব্যবহার (আজোটোব্যক্টর, রাইজোবিয়াম, পি.এম.বি. প্রভৃতি)। ৯. মাটি পরীক্ষা, সমীক্ষা ও সারের সঠিক প্রয়োগ।	৩. জৈব ও উদ্ভিদ (ভেষজ) কীটনাশক ব্যবহার শিঁয়ালকাটার তেল। ৪. যান্ত্রিক পদ্ধতি যেমন আলোক, ফাঁদ শস্য পাশ ব্যবহার - সরষের ফ্লি-পোকা দমনে শস্যপাশ হিসেবে বুনো সরষে ক্ষেতে মাঝে মাঝে বুনে দেওয়া।	

কয়েকটি কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি -

চাষবাসের কাজে সহায়তার জন্য কৃষি দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচির সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। দরিদ্র চাষীদের মিনিকট, বীজ রাখার পাত্র, সহায়ক মূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা আছে। উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির শস্য এবং উন্নত প্রথার চাষ, উদ্যান পালন এবং উন্নত প্রযুক্তির বিষয়ে নারী ও পুরুষ কৃষিজীবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, বর্গাদার, পাট্টাদার ও দরিদ্র চাষীদের খরিফ, রবি ও বোরো চাষের সময় ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে। অসহায় বৃদ্ধ কৃষক শ্রমিকদের পেনসন দেওয়ার প্রকল্প আছে। এই সুযোগ নারীও পেতে পারে।

তৈলবীজ উৎপাদন প্রকল্প: -

ভোজ্য তেলের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য তৈলবীজ উৎপাদন প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধাগুলি হল: -

(ক) প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের উন্নত জাতের বাদাম সরিষা ও তিল বীজের মিনিকট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

(খ) শস্য ক্ষেত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৈলবীজ উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও কীটনাশকের পঞ্চাশ শতাংশ খরচ সরকার বহন করে।

(গ) এই প্রকল্পে কৃষক নির্বাচন সাধারনত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

(ঘ) কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে কৃষি বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈলবীজ উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণ করা হয়।

সুসংহত তুন্ডল ‘জাতীয় শস্য উন্নয়ন প্রকল্প: -

এই প্রকল্পে তুন্ডল জাতীয় শস্য যেমন শস্য যেমন ধান, গম, জোয়ার, বাজরা ও ভুট্টা প্রভৃতি নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজের ব্যবহার ও উৎপাদন প্রযুক্তির মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ক্ষেত্র প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন কৃষি উপকরণ বিনামূল্যে চাষীদের সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া পঞ্চাশ শতাংশ ভুর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন স্পেয়ার, থ্রেশার, ডাস্টার ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

জাতীয় ডালশস্য উন্নয়ন প্রকল্প: -

দেশে ডাল জাতীয় শস্যের উৎপাদন ক্রমশঃ নিম্নগামী হওয়ায় জাতীয় ডাল শস্য উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে উন্নত জাতের বীজ, ফসফেট সার ও অনুখাদ্য প্রভৃতি বিনামূল্যে চাষীদের সরবরাহ করা হয়।

সুসংহত উপায়ে রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এই প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে। ডাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডাল প্রক্রিয়াকারক যন্ত্র এই প্রকল্পে পঞ্চাশ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। অধিকাংশ ডাল জাতীয় শস্য শিম্বি গোত্রীয় উদ্ভিদ হওয়ার জন্য, জীবাণু সার যথা রাইজোবিয়াম কালচার) মিনিকেটের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সমস্ত রকম নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থানীয় পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদ এবং কৃষি উপসমিতিতে আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে।

সুসংহত উপায়ে রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প: -

বেহিসাবী ও অযথা কৃষি বিষ জমিতে প্রয়োগের ফলে পরিবেশ ও খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে পড়েছে।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সুসংহত উপায়ে রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে।

এই পদ্ধতিতে কৃষি ক্ষেতে বন্ধ পোকা ও শত্রু পোকার সঙ্গে কৃষকের পরিচয় করানো হয় এবং বন্ধু পোকার সংখ্যা ক্ষেতে কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এই ধরনের শিবিরে ৩০-৩৫জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন কৃষি বিশেষজ্ঞ এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে চাষীদের রোগ ও পোকা সম্বন্ধে শিক্ষিত করেন।

নিবিড় পাট উন্নয়ন প্রকল্প: -

এই প্রকল্পে পাটের তন্তুর গুণগত মান বাড়ানোর জন্য নিম্নোক্ত সুবিধা আছে।

(ক) ভর্তুকিতে উন্নত জাতের পাট বীজ সরবরাহ।

(খ) পাতায় ইউরিয়া স্প্রে করার জন্য ভর্তুকিতে ইউরিয়া সরবরাহ।

(গ) পঞ্চাশ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি যথা বীজ বপন করার যন্ত্র, স্প্রেয়ার, ডাস্টার এবং পাটের আঁশ ছাড়াবার যন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) পরিস্কার ও কম জলে পাট পচানোর জন্য পাট জাগ দেওয়ার পুকুর তৈরি করার ব্যবস্থা এই প্রকল্পে রাখা হয়েছে।

(ঙ) এছাড়া ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার কালচার ব্যবহার করার কথা এই প্রকল্পে বলা হয়েছে।

বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে জাতীয় জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচি: -

১৯৯২-৯৩ সালে এই কর্মসূচি সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও চালু হয়েছে। এমন সব ব্লকে এই কর্মসূচি চালু করা যায় যেখানে মোট সেচ সেবিত এলাকার পরিমাণ ৩০ শতাংশের কম। বর্তমানে রাজ্যের প্রায় ৫০% ব্লকে বিশেষতঃ

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার বেশ কিছু অংশে এই কর্মসূচি চালু আছে। আবার এই রকম ব্লকের মধ্যেও এমন এলাকায় ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা চিহ্নিত ও নির্বাচিত করতে হয় যাতে ওই ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা অঞ্চলে আবাদী জমির পরিমাণ ৫০শতাংশের বেশি থাকে।

এই কর্মসূচিতে যে সব প্রকল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলি হল অনাবাদী বা চাষযোগ্য নয় এমন জমিতে ও নিকাশী নালায় মৃত্তিকা ও রস সংরক্ষণ, কৃষিবন, চারণভূমি, ফলের বাগান ইত্যাদি সৃষ্টি করা, আবাদী জমির উন্নয়ন, উৎপাদন বাড়ানো এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

উন্নত কৃষি যন্ত্রাদি সরবরাহ কর্মসূচি: -

এই কর্মসূচিতে সকল প্রকার চাষীকেই পাওয়ার টিলার, থ্রেশার, ডাস্টার, স্প্রেয়ার প্রভৃতি কিনে ব্যবহার করতে উৎসাহ এবং সাহায্য দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তফশিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য ৩০শতাংশ কোটা থাকে। উপরোক্ত যন্ত্রগুলি কেনার ক্ষেত্রে মূল্যের ২৫শেতাংশ বা ২৫,০০০টাকা যেটি কম সেটি অনুদান হিসাবে পাওয়া যায়। এই অনুদান ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার ৯০ : ১০ অনুপাতে বহন করে।

পাওয়ারটিলার পাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য একটি শর্ত হল এই যে চাষীর পাঁচ একর সেচসেবিত জমি থাকা প্রয়োজন।

মিনিকিট প্রদর্শন এবং বিতরণ কর্মসূচি: -

শুধুমাত্র ধান গমই নয়, বাদাম, সরিষা, তিল, পাটবীজ এবং অন্যান্য অনেক শস্য এই মিনিকিট কর্মসূচির অন্তর্গত। নূতন ধরনের কোনও বীজকে ছোট জমিতে সম্পূর্ণ সরকারী নজরদারীতে পরীক্ষামূলক চাষ এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে তার উৎকর্ষতার বিচার করা হয়। এই মূল্যায়নের পরে সেই উন্নত বীজকে মিনিকিটের মাধ্যমে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এইসব কর্মসূচি বিষয়ে অতিরিক্ত খবরাখবর এবং তথ্যের জন্য ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ: - গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণীসম্পদ বিকাশের অগ্রগণ্য ভূমিকা রয়েছে একথা অনস্বীকার্য। কারণ কৃষিতে সীমাবদ্ধতা প্রায় এসে গেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে প্রাণীসম্পদ এখন কৃষির পরের স্থানেই রয়েছে। প্রাণী যে সম্পদ - সেটা বোধ হয় বুঝতে কারও অসুবিধা নেই। অন্যান্য সম্পদের যেমন বিকাশ/উন্নয়ন ঘটানো যায়, প্রাণীসম্পদেও তা সম্ভব। প্রাণীসম্পদের বিকাশ বলতে সাধারনভাবে তিনটি বিষয়কে বোঝায় - (১) উন্নয়ন (২) সম্প্রসারণ ও (৩) সংযোজন। প্রাণীসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্য হল - গৃহপালিত প্রাণী সম্পদের প্রজাতিগত মান বাড়ানো। এ রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর, তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ - এককথায়, গ্রামের অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল মানুষেরা বহুকাল আগে থেকে পুরানো প্রথায় গ্রামাঞ্চলে প্রাণীপালন করে আসছেন। এইসব দেশী প্রাণীকূল যেমন- গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী ভেড়া, ছাগল ও শূকর ইত্যাদি নির্দিষ্ট মানের নয় বলে, এদের উৎপাদনক্ষমতা খুবই কম। এর ফলে আমাদের রাজ্যে দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদির উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হচ্ছে। যদি আমরা সমবেত প্রচেষ্টায়, উন্নতমানের প্রজাতির সঙ্গে দেশী প্রজাতির প্রাণীর সংকরায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে তাদের প্রজাতিগত মান উন্নত করার কাজ - উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে করতে পারি। তাহলে সেই সব দেশী প্রাণীর গর্ভজাত উন্নত প্রজাতির প্রাণীদের থেকে আমারা অনেক বেশি পরিমান দুধ, মাংস ও ডিম ইত্যাদি পেতে পারি। এ কাজ আমাদে রাজ্যে চলছে, এর সার্বিক প্রসারের দায়িত্ব উপসমিতিকে নিতে হবে। সাধারনভাবে এটাই হল প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন।

সমাজের শুরু থেকেই মানুষ প্রাণীপালনের সঙ্গে যুক্ত হলেও বর্তমান সব পরিবার - বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সব পরিবার প্রাণীপালনের সঙ্গে যুক্ত নয়। যে সব পরিবার প্রাণীপালন করেন, তাদের আবার সকল সদস্য এ কাজ করেন না। আবার অনেক পরিবারে সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকলেও একাধিক প্রানীপালনের সঙ্গে যুক্ত নয়। সম্প্রসারণের অর্থ হল - সম্ভাব্য পরিবারের সদস্যকে এবং প্রত্যেক পরিবারকে উন্নত প্রজাতির প্রাণীপালনের সঙ্গে যুক্ত করা। চীনদেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবার শূকর পালন করে। শূকরের মলকে কাজে লাগিয়ে সেখানে গ্রামাঞ্চলে জৈব গ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করে সরবরাহ করা হয়। সে রকম সম্ভাবনা আমাদের রাজ্যে স্থান বিশেষে রয়েছে।

দেশীয় প্রাণীকে উন্নত করাই প্রানীসম্পদ বিকাশের শেষ কথা নয়, দেশবিদেশের নানা উন্নতজাতের প্রাণী- যাদের কাছে অনেক বেশী উৎপাদন পাওয়া সম্ভব - বিজ্ঞানসম্মত উপায়েও প্রযুক্তিগত পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই সব সম্ভাবনাময় সমাজের সাথে আমাদের রাজ্যের প্রাণীপালকদের যুক্ত করার নামই সংযোজন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রাণী বিকাশ সহায়ক রয়েছে। উপসমিতির প্রাথমিক কাজ হল- প্রাণীপালনের বিভিন্ন বিষয় - যথা প্রাণী,

প্রাণীস্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, সচেতনতা, বিপনন ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রানী বিকাশ সহায়কদের সঙ্গে স্থানীয় প্রাণীপালকদের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে দেওয়া। প্রাণী বিকাশ সহায়কগণ গ্রামাঞ্চলে প্রাণী সম্পদের প্রযুক্তির প্রয়োগ ও রূপায়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। (১) বৈজ্ঞানিক প্রথায় গো-জনন (২) সঠিক হিসাবপত্র ও প্রানীবিকাশ সংক্রান্ত নথিরক্ষা (৩) উৎপাদন সামগ্রী যেমন - ডিম, মাংস, দুধ ইত্যাদির সঠিক হিসেব রাখা (৪) সবুজ গো-খাদ্যের চাষ, উৎপাদন, বিতরন ইত্যাদি দেখা (৫) টিকাদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রাণীস্বাস্থ্য শিবির ইত্যাদির আয়োজন করা, (৬) ডিম, মাংস ইত্যাদির বিপননের জন্য প্রাথমিক সমবায় শিবির গঠন করা (৭) সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুস্থ প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা জন্য প্রাণীমেলার আয়োজন করা (৮) জনসংযোগের মাধ্যমে মানুষকে প্রাণীপালনে আগ্রহী করা ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি/উপসমিতির সহযোগিতায় বিভাগীয় প্রকল্প রূপায়নের কাজ দ্রুত করা।

এইভাবে আমরা যদি প্রাণীসম্পদের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রাণীপালকদের কর্মধারার সাথে যুক্ত করতে পারি, প্রাণী বিকাশ সহায়কদের সহযোগী ভূমিকা কাজে লাগাতে পারি, তবেই হবে প্রাণীসম্পদের সত্যিকারের বিকাশ।

প্রাণী সম্পদ বিকাশের লক্ষ্য: - প্রাণীসম্পদ বিকাশের লক্ষ্য তিনটি: - (১) পরিবারের অতিরিক্ত আয় (২) স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থান (৩) দৈহিক পুষ্টি ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে রাজ্যের উৎপাদিত প্রাণীজাত পণ্যের ঘাটতিপূরণ।

ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৮শতাংশ জনসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ মাত্র ২ শতাংশ। ফলে কৃষিতে চাপ অনেক বেশি কৃষিতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, কিন্তু কৃষি ফসলের দাম সেই হারে বাড়ে নি। কৃষকের আয় আনুপাতিক হারে কমেছে। তাই কৃষকের অতিরিক্ত আয় করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কৃষি ফসলের অবশিষ্ট অংশ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীর খাদ্য। এক্ষেত্রে কৃষির পর বা কৃষির পাশাপাশি - একমাত্র উন্নত প্রথায় প্রাণীপালনই পারে প্রত্যেকটি পরিবারের অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র - যেখানে লাভজনক স্বনিযুক্তি সম্ভব, তার নাম প্রাণীপালন বা প্রাণীসম্পদ বিকাশ। সরকারি অনুদান/ কর্মসূচী ভিত্তিক সুপরিকল্পিত উদ্যোগ এই উপসমিতি নিলে, এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের একটা বড় অংশের বেকার যুবক-যুবতীদের সার্থকভাবে স্বনির্ভর করা যেতে পারে।

দৈহিক পুষ্টি ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে প্রাণীজাত পণ্যের বিকল্প নেই। পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণে দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। প্রাণীজাত সামগ্রীর এই চাহিদা মেটাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই এ রাজ্যে প্রাণীসম্পদের বিকাশ আরও ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ: কী ভাবে- চাহিদা বিকাশের অন্যতম একটি কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। বিকাশের জন্য দরকার সুযোগ, সম্ভাবনা ও পরিকল্পিত উদ্যোগ। কৃষিবিজ্ঞানের মত প্রাণীবিজ্ঞানে ঘটেছে অভাবনীয় পরিবর্তিন। কৃষিতে উন্নত বীজের মত প্রাণী বিজ্ঞান সম্ভব করেছে কৃত্রিম প্রজনের মাধ্যমে প্রাণীর উন্নত প্রজাতিতে রূপান্তর, আবিস্কৃত হয়েছে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উন্নত ব্যবস্থা, কারখানায় তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের সুষম পুষ্টিকর খাবার। অল্প জমিতে অধিক পুষ্টি সম্পন্ন অধিক পরিমাণে গোখাদ্য হিসেবে সবুজ ঘাস উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। একটি দেশী গরু যেখানে গড়ে ২ লিটার দুধ দেয়, সেখানে একটি সংকর গরু (গাভী)) কমপক্ষে ৩গুণ বেশি দুধ দিতে সক্ষম। উন্নত জাতের গরু ২০ থেকে ৪০ লিটার দুধ দিতে সক্ষম। দেশী হাঁস, মুরগী যেখানে বছরে ৮০ থেকে ১০০ টি ডিম দেয়। সংকর জাতীয় হাঁস, মুরগী ১৫০ থেকে ২০০টি ডিম দেয়, খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁস বছরে ৩০০টি ডিম দেয়। তাই কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার আরো প্রসার ঘটানোর দিকে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

প্রাণীসম্পদ বিকাশে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা। সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধার খবর, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পঞ্চায়েতের এই উপসমিতি বিভাগীয় কর্মীদের সহযোগিতায় এবং বিভিন্ন গণ সংগঠন - বিশেষ করে কৃষক, মহিলা ও যুব সংগঠনগুলির সহায়তায় গ্রামাঞ্চলের প্রাণীপালক ও মহিলাদের প্রাণীসম্পদ বিকাশের এই সম্ভাবনাময় কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।

মৎস্যচাষ: - প্রাণীসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান, গ্রামীণ অর্থনীতি সজীব রাখতে

মৎস্যচাষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ২০০১-২০০২ সালে মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ১১লক্ষ টনে পৌঁছছে, যে সব রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি এবং এ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের (১১.৫৮লক্ষ টন) প্রায় ৯৫শতাংশ। বিকল্পনীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে রাজ্যের লক্ষ্য হল - মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে মাছের রপ্তানী ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা এবং সমাগ্রিক পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে রাজ্যের সাধারন মৎস্যজীবিদের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর মাধমে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।

মৎস্য দপ্তরের মাছ চাষের যে সব প্রকল্প রয়েছে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল: -
(১) পতিত ও আরও নতুন নতুন জলাশয়কে মাছচাষের আওতায় এনে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় খাবার উপযোগী মাছের উৎপাদন ও যোগান বাড়ানো।
(২) মাছ চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশ সাধন এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা।
(৩) মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্রসীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করা।
(৪) মৎস্যজীবিদের জন্য কল্যাণমুখী প্রকল্পের রূপায়ন এবং
(৫) মৎস্যচাষ ও জলাশয় সংরক্ষণ বিষয়ে মানুষের মনে চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রাখার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

দুটি ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তির প্রয়োগের পাশাপাশি মাছচাষের এলাকা বাড়ানো দরকার। গ্রামাঞ্চলের বিল, নয়নজুলি, মজা জলা, পতিত জলাশয় সংস্কার করে নতুন নতুন কিছু পুকুর, কেটে বা নীচু জমিকে কাজে লাগিয়ে এই এলাকা বাড়ানো যেতে পারে। অন্তর্দেশীয় জলা (৫কোটা বা তার বেশি) ভরাট করা বেআইনী। ঐরকম জলা পতিত থাকলে তা সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে মাছচাষের জন্য লীজ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া কৃষির জমিতে কোথাও কোথাও জলসেচের সমস্যা মেটাতে কৃষি জমির একটি অংশে (সাধারনতঃ জমির পাঁচভাগের একভাগ অংশে) নির্দিষ্ট গভীরতার পুকুর কেটে সেই জলে সেচের মাধ্যমে জমির বাকি চার ভাগ অংশে বহু ফসলের চাষ এবং একই সঙ্গে মৎস্য চাষও করা সম্ভব। ঐ পুকুরের বাঁধ অংশে শাকসবজির চাষ ও করা যায়। কৃষি জমির সুবিধামত তিনদিকে চওড়া গভীর নালা কেটেও (প্রায় আটফুট চওড়া ও ৩ফুট চওড়া বাঁধ) এই সেচ ও মাছচাষ এবং বাঁধে শাকসবজি, নারকেল, পেঁপে, সুবাফুল প্রভৃতি গাছ লাগালে জমিতে গাছের পাতা জমিতে পড়ে সবুজ সার ও নালায় পড়ে মাছের খাদ্য হতে পারে। চাষের জমি নষ্ট হবার আশঙ্কায় অনেক কৃষকই এ পথে যেতে চাইবে না। কিন্তু অসেচসেবিত অঞ্চলে ঐ জমি হলে জমিতে সেচের ব্যবস্থায় বহু/মিশ্র ফসলের চাষের ফলে ২ বছরের মধ্যে ঘাটতিপূরণ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ধাপে আয় মৎস্য চাষ, শাকসবজি প্রভৃতি সহযোগে বাড়বে। রাজ্যের বিকল্পনীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রামাঞ্চলে অন্ততঃ অসেচসেবিত এলাকায় কৃষকদের এই ধরনের বহু/মিশ্র ফসলের চাষের সঙ্গে মৎস্যচাষ যাতে জমিতেই পুকুর খনন করতে পারে সে বিষয়ে এই উপসমিতির উদ্যোগ গ্রহণ ও সঠিক প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।

শুধু অধিক উৎপাদনই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ নয়, বরং তা বিপদের সৃষ্টি করে যদি উপযুক্ত বিপনন ব্যবস্থানা থাকে। দুধের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে বিপনন ব্যবস্থা উন্নত। প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, দুগ্ধ সমবায় ও পঞ্চায়েত একযোগে একে অপরের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন মিল্ক ফেডারেশন, জেলায় মিল্ক ইউনিয়ন, উৎপাদক সমিতি, দুগ্ধাগার ও চিলিং প্লান্ট (শীতলাগার) এইসবের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুধের বিপন্ন উৎসাহ ব্যঞ্জক। তাই অন্যান্য প্রাণীজাত পন্যের ‘সমবায় মাধ্যমে’ সংগ্রহ ও বিপনন প্রক্রিয়াই নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। এই উপসমিতিকে এই বিষয়ে সমবায় গড়ে তোলার প্রয়াস নিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে প্রাণীসম্পদ বিকাশের জন্য এই উপসমিতি যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবে, সেগুলি হল:
(১) মৎস্যচাষ/ প্রাণীপালনের মাধ্যমে স্ব-নিযুক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি;
(২) হিমায়িত গো বীজ দ্বারা নিবিড় কৃত্রিম প্রজনন প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ;
(৩) বিভিন্ন প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সার্থক রূপায়নে সহায়তা করা;
(৪) সুষম প্রাণীখাদ্য ও সবুজ গো-খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস ও পরিকল্পনা
(৫) তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র মানুষদের জন্য প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকল্পগুলি দ্রুত রূপায়নের ব্যবস্থা করা;
(৬) প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো এবং তার জন্য স্থানীয় এলাকায় প্রশিক্ষণ শিবির করা;
(৭) সুসংহত প্রাণীপালন কর্মসূচীতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত করা ও তাদের উৎসাহিত করা;
(৮) প্রাণীজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন ও বিপননের ক্ষেত্রে সমবায় উদ্যোগকে সহযোগিতা করা ও সমবায়ভিত্তিক ঋণদানের ব্যবস্থা করা;এবং
(৯) প্রাণীসম্পদ বিকাশ, প্রানী স্বাস্থ্য বিভাগ, মৎস্য দপ্তর, কৃষিবিভাগ এদের মধ্যে সার্থক সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

জেলার মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থার (এফ.এফ.ডি.এ) মাধ্যমে পুরানো রীতিনীতির বদলে নতুন বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তির প্রয়োগে মৎস্যচাষের উৎপাদন হার বাড়ানো যেতে পারে। এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মৎস্যচাষী ব্যাংক থেকে ঋণ ও অনুদান হিসেবে পেতে পারেন। মৎস্যচাষীদের কারিগরি জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এই সংস্থার মাধ্যমে জেলার ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে হয়ে থাকে। এই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন মৎস্য চাষ প্রকল্পের আওতায় জলাশয়/পুকুকে আনা যায়। যার পুকুর, বিল, পতিত জলাশয়, নীচুজমি আছে যেখানে সারা বছরই জল জমে থাকে - সেইসব ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি বা দল এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন। কমপক্ষে ২৫শতক বা ১৫কাটা জলা হতে হবে। স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী লিজেও পুকুর নেওয়া যায়। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বৃহৎ সকল মৎস্যচাষীই এই প্রকল্পের সুযোগ পেতে পারেন। বিভিন্ন মৎস্যচাষ প্রকল্প ঐ রকম জলাশয়ে/পুকুরে মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা পঞ্চায়েতের সুপারিশে ব্যাংক ঋণ ও অনুদান সহযোগে রূপায়িত করে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য মৎস্যদপ্তরের কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্পও রয়েছে এগুলি হল: - (১) আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের মাছ চাষে প্রশিক্ষণ (২) যাদের নিজস্ব জলাশয় আছে তাদের নিবিড় মাছ চাষে হাতে-কলমে শিক্ষা (৩) জাল ও মাছ চাষের সরঞ্জামাদি সরবরাহ; (৪) মাছ চাষের সহায়ক কর্মসূচির সম্প্রসারণ; (৫) মিনিকট সরবরাহ; (৬) মাছের সঙ্গে হাঁস চাষের প্রকল্প।

মৎস্য দপ্তর মৎস্যজীবি পরিবারে মহিলাদের মাছ ধরার টানা জাল, ছাটজাল প্রভৃতির তৈরি ও মেরামতির প্রশিক্ষণ দেয়। গ্রাম পঞ্চায়েত/উপসমিতি সুপারিশ অনুযায়ী মৎস্যজীবি পরিবারের মহিলাকে (১৬ থেকে ৫০ বছর) ১৫ বা ৩০ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। প্রশিক্ষণ পাওয়া মহিলাদের পরে মৎস্য উৎপাদন গ্রুপে ভাগ করে প্রতি গ্রুপে চার হাজার টাকা মূল্যের জাল বোনার সুতো দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী মহিলার দৈনিক ১৫টাকা করে ভাতাও পায়।

এছাড়া, বৃদ্ধ মৎস্যজীবি, যাঁর বয়স তার বেশি, তিনি বার্ধক্যভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। উপসমিতি/ গ্রামপঞ্চায়েতের সুপারিশ নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির অনুমোদনে এটা হয়। ব্লক থেকে ভাতার মাসিক ৩০০ টাকা প্রাপককে পাঠানো হয়। পঞ্চায়েত সমিতির জন্য এই ভাতা প্রাপকের নির্দিষট কোটা থাকে।

দরিদ্র মৎস্যচাষীদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য দুর্ঘটনাজনিত জীবনবীমা প্রকল্প রয়েছে। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত মৎস্যজীবি এই জীবনবীমার আওতায় আসবেন। সাধারনত সমবায় সমিতির সদস্যরা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। মৎস্য শিকার করতে গিয়ে মৎস্যজীবি সাপের কামড়ে, দুর্ঘটনা বা জলেডুবে মারা গেলে এই বীমা প্রকল্পের সুযোগ মৃতের পরিবার পায়। কর্মরত অবস্থায় প্রানহানি ঘটলে ৩৫,০০০টাকা এবং স্থায়ী শারীরিক অঙ্গহানির জন্য ১৭,৫০০টাকা দেওয়া হয়।

আরও কয়েকটি প্রাণী সম্পদ বিকাশ কর্মসূচি: -

প্রাণী সম্পদ বিকাশ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে হাঁস, মুরগী, ছাগল, গাভী ইত্যাদি পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, দরিদ্র পরিবারের মধ্যে হাঁস ও মুরগির বাচ্চা বিতরণ, পশুখাদ্য চাষের জন্য বীজ বিতরণ, সঙ্কর জাতের পুং ছাগল ও ভেড়া বিতরণ ইত্যাদি। প্রাণী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম প্রজনন, কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পরিষেবা, যার সাহায্যে সুযোগ-সুবিধা, টিকা প্রদান, কৃমি নাশ করা ইত্যাদি। এসব সুবিধা ব্লকের প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলের দূরবর্তী এলাকায় প্রাণী স্বাস্থ্য আধিকারিকের পরিচালনায় প্রাণী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এছাড়াও রয়েছে মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি। স্বনিযুক্তি ও জীবনের মান বাড়ানোর জন্য অনেকগুলি প্রকল্প চালু আছে। ভেড়িতে, নদীতে, সমুদ্র উপকূলে জাল টেনে নৌকা, ট্রলার ইত্যাদির সাহায্যে মাছ ধরার কাজে মূলতঃ পুরুষরাই যুক্ত থাকে। তবুও মৎস্যকেন্দ্রিক রুজি-রোজগারে নারীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

অন্তর্দেশীয় মাছ চাষ কর্মসূচি: -

এই কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

- মৎস্য উৎপাদকের কাছে কারিগরী অন্যান্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।
- ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা।
- মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী লীজের বন্দোবস্ত করা।
- অন্যান্য দপ্তরের কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- বাজারে সহায়তা।

কারা এই কর্মসূচির আওতায় আসবেন: -

ক্ষুদ্র, প্রান্তিক বা বৃহৎ সমস্ত চাষী বা তাদের গ্রুপ বা সমবায় সমিতি এই কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেন।

জেলাস্তরে মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা (FFDA) এই কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে থাকেন।
ব্লক স্তরে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক মাঠের কাজের রূপায়ণ ও তদারকির দায়িত্বে থাকেন। জেলাস্তরে ডেপুটি ডিরেক্টর এই কর্মসূচির তদারিকির দায়িত্বে থাকেন। এই কর্মসূচির আওতায় উপভোক্তা নির্বাচন ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বে রয়েছেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি।

এই কর্মসূচিতে প্রথমে উপভোক্তা নির্বাচন করা হয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। এরপর এই নির্বাচিত মৎস্যচাষী বা দলের জন্য প্রশিক্ষণ সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী পুকুর বা জলাশয় (নিজের পুকুর বা জলাশয় না থাকলে) লীজের জন্য সাহায্য করা হয়। এবং তারপর মাছ চাষের জন্য প্রকল্প হয়। যে কোনো জলাশয় যার আয়তন ০.১ হেক্টর থেকে ৫.০হেক্টর সেই সমস্ত জলাশয়ে মাছ চাষে সহায়তা প্রদান করা হয়।

এই কর্মসূচিতে সহায়তা পাওয়া যায় এরকম কয়েকটি নমুনা প্রকল্প: -

(১) মিষ্টি জলে ৬ ধরনের মাছ চাষ (যেখানে মাটি কাটার প্রয়োজন নেই)।
(২) মিষ্টি জলে ৬ ধরনের মাছ চাষ (০.২ মিটার থেকে ০.৩মিটার পর্যন্ত মাটি কাটতে হবে)।
(৩) মিষ্টি জলে ৬ ধরনের মাছ চাষ (০.৬ মিটার পর্যন্ত মাটি কাটতে হবে)।
(৪) মিষ্টি জলে ৬ ধরনের মাছ চাষ (৩ফুট বা ১মিটার পর্যন্ত মাটি কাটতে হবে)।

এই কর্মসূচীতে যে ব্যক্তি বা দল সহায়তার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাদের এলাকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রকল্প বা স্কীম তৈরী করতে হয়। ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

এই কর্মসূচির সহায়তা নিয়ে একদিকে মৎস্যচাষের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অন্যদিকে মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা অনেক।

বাস্তবে এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে মাছের চারা না পাওয়া, পুকুর বা জলাশয় দীর্ঘমেয়াদী লীজে না পাওয়া, চাষীকে ঠিকমত সঠিক সময়ে পরামর্শ না দেওয়া, পুকুরের চারাপোনা ধরে ফেলা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। আর এই অসুবিধাগুলি দূর করার কাজে নেতৃত্ব দিতে পারে এই স্থায়ী সমিতি।

গ্রামের পড়ে থাকা জলাশয়/ পুকুরগুলি লীজ নিয়ে স্বনির্ভর দলগুলি মাছ চাষ করতে পারে তার জন্য উদ্যোগ নিতে পারে। এই কর্মসূচির সহায়তায় যে দলগুলি মাছ চাষ করতে উদ্যোগী হবে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করা যায়। এর জন্য দরকার সঠিক লীজের শর্ত তৈরী করা এবং পুকুরের মালিকদের নিয়ে আলোচনায় বসা। প্রয়োজনে এই কর্মসূচির সঙ্গে অন্য ঋণদানের কর্মসূচি যেমন এস.জি.এস.ওয়াই, এস.সি.পি., টি.এস.পি. প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে এই ঋণের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

(২) মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ (অন্তর্দেশীয় মাছ চাষের জন্য): -

এই কর্মসূচির আওতায় মৎস্যচাষী বা চাষীদের দল বা সমবায় সমিতিকে প্রশিক্ষণের সহায়তা পাওয়া যায়। যে ধরণের প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় সেগুলি হল: -

	প্রশিক্ষণ মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ	কার কাছে আবেদন করতে হয়
(ক)	গ্রামস্তরে ১০দিনের প্রশিক্ষণ	জেলা মৎস্য আধিকারিক উপঅধিকর্তা
(খ)	জেলা স্তরে ৩০দিনের প্রশিক্ষণ	
(গ)	রাজ্যস্তরে ৯০দিনের প্রশিক্ষণ	

সবক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করার দায়িত্ব এই স্থায়ী সমিতি। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যারা প্রশিক্ষণ নিতে চান তাদের আবেদন পত্র পঞ্চায়েত সমিতির কাছে এলে এই স্থায়ী সমিতি আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারকের মাধ্যমে আবেদন পত্রগুলি পাঠাতে হবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর দিতে পারবেন ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক।

(৩) মিনি কিট, জল শোধক যন্ত্র প্রভৃতি বিতরণ এবং সামাজিক মৎস্যচাষের উন্নয়ন: সরকারি জলাশয়গুলি (যেমন পঞ্চায়েতের নিজস্ব জলাশয়, কোনো দপ্তরের বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় জলাশয় ইত্যাদি)। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিয়ে এই জলাশয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব কোনো স্বনির্ভর দল বা মৎস্য সমবায়কে দিলে তার থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এই ধরনের পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এই কর্মসূচির সহায়তা পাবেন দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যরা। সরকারে - খাস হওয়া সমস্ত পুকুর, গ্রাম পঞ্চায়েতকে হস্তান্তর করা হয়। সেই

রকম পুকুর যার আয়তন ২ হেক্টর বা তার বেশী, সেগুলিতে এই কর্মসূচির সহায়তা দেওয়া যায়। মূলতঃ কারিগরী পরামর্শ দেওয়া মাছ চাষের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন - হাঁড়ি, জাল, জলশোধক যন্ত্র ইত্যাদি এবং কিছু ডিমপোনা দেওয়া যায় এই কর্মসূচির আওতায়। কেবলমাত্র হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলা বাদে বাকী জেলায় এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে।

(৪) ময়লা জলে মাছ চাষ: - কলকাতার পূর্ব উপকন্টে প্রায় ৪০০০হেক্টর ময়লা জলের জলাশয় আছে। শহরাঞ্চলের পরিবাহিত ময়লা জল মাছ চাষের জলাশয়ে এসে মেশার ফলে প্রচুর উদ্ভিদ ও প্রাণীকনার সৃষ্টি হয় যা মাছের খাদ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এর ফলে আলাদা কোনো সার দেওয়ার দরকার হয় না। এছাড়াও অন্যজায়গাতে যেখানে ময়লা জলে মাছের চাষের সুযোগ আছে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় নবদ্বীপে ও শ্রীরামপুর ৭০লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটো পাইলট প্রজেক্ট রূপায়ণ করা হচ্ছে,

(৫) মৎস্য দপ্তরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প: -

সারা পশ্চিমবঙ্গেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ছড়িয়ে আছেন। সাধারনতঃ তারা গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেন এবং বেশীর ভাগই খুব গরীব। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য মৎস্যদপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

(ক) আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মাছ চাষের প্রশিক্ষণ।

(খ) আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে যাঁদের নিজস্ব জলাশয় আছে। তাঁদের হাতে কলমে শিক্ষাদান।

(গ) জল ও মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ।

(ঘ) মাছ চাষের সহায়ক কর্মসূচির সম্প্রসারণ।

(ঙ) মিনিকট সরবরাহ।

(চ) মাছের সঙ্গে হাঁস চাষের প্রকল্প।

(৬) মৎস্যজীবি মহিলাদের জাল বোনার প্রশিক্ষণ: -

মৎস্যজীবি পরিবারের মহিলারাই সাধারনভাবে জাল বোনা, মেরামতির কাজ করে থাকেন। তাঁদের এই কাজে দক্ষতা বাড়িয়ে কিছু অতিরিক্ত আয়ের সংস্থায় সংস্থান করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। অন্তর্দেশী জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য প্রয়োজনীয় টানা জাল, ছাট জাল এবগ খেপলা জাল ইত্যাদি তৈরীর জন্য মৎস্যজীবি পরিবারের ১৬ থেকে ৫০বছর পর্যন্ত বয়সের মহিলাদের ১৫ কিংবা ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৭) নদীতে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প: -

নদীতে স্থায়ী মৎস্যভান্ডার সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং নদীর তীরের বসবাসকারী মৎস্যজীবিদের কর্মসংস্থান করার উদ্দেশ্যে 'নদীতে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প' শুরু হয়েছে। এক সময়ে মাছের উৎস্য নদীগুলি বর্তমানে নানান কারণে মৎস্যশূণ্য হয়ে পড়ছে। রাজ্যের হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার ২০টি স্থানে অর্থ্যাৎ ভাগিরথী, হুগলী, ভৈরব, জলঙ্গী, কুন্তী, রূপনারয়ণ, দামোদার, দ্বারলেশ্বর এবং মুন্ডেশ্বরী ইত্যাদি নদীতে প্রায় ২০ লক্ষ চারাপোনা ছাড়া হয়। এই প্রকল্প গ্রহণের জন্য স্থান নির্বাচন করে জেলা পরিষদ। স্থান নির্বাচন করা হলে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পদাধীকারীদের উপস্থিতিতে মৎস্যদপ্তর থেকে নদীতে মাছ ছাড়া হয়।

(৮) একত্রে মুরগী, হাঁস ও মৎস্য চাষ প্রকল্প: -

যে কোনো পুকুর ও তার চারধার ব্যবহার করে একসঙ্গে হাঁস, মুরগী ও জলে মাছ চাষ করে গরীব চাষীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ৫৪টি স্ত্রী হাঁস, ৬টি পুরুষ হাঁস নিয়ে একটি ইউনিট তৈরী হয়।

ইচ্ছুক মৎস্যচাষী বা স্বনির্ভর দল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশ সহ আবেদন করলে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি আবেদন করে অনুমোদন দেন। এই প্রকল্পে অনুদান শতকরা ৫০ভাগ।

(৯) একত্রে শূকর ও মৎস্য চাষ: -

আগের প্রকল্পের নিয়মেই রূপায়িত হবে।

(গ) ঝোরার জলে মাছ চাষ: -

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের জন্য পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে।

(ঘ) জিওল মাছের চাষ: - মাগুড়, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছের চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এই কর্মসূচির মূল্য উদ্দেশ্য।

নোনা জলে মাছ চাষ: -

ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নোনা জলের জলা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, আর সেইজন্য নোনা জলে মাছ চাষের সম্ভাবনাও প্রচুর। আর সেই উদ্দেশ্যেই পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগণায় ''নোনা জলে মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা'' (বি.এফ.ডি.এ.) গঠিত হয়েছে।

বি.এফ.ডি. এর মাধ্যমে যে প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয় সেগুলি হল: -

(ক) এক হেক্টর জলায় একত্রে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ,

(খ) এক হেক্টর জলা চিংড়ি চাষ।

উভয় প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল: -

- ❖ প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কাজ।
- ❖ জলাভূমির বন্দোবস্ত করা।
- ❖ ঋণ ও অনুদান (বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ)।
- ❖ বেনফিশের মাধ্যমে মাছ চাষের সরঞ্জাম/ ডিমপোনা দেওয়া।
- ❖ বিপননের সহায়তা।

সাধারনভাবে মৎস্যচাষীদের সমবায়, মৎস্য উৎপাদক গ্রুপ, ব্যক্তি এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারে। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশসহ পঞ্চায়েত সমিতির কাছে আবেদন করবেন।

সমুদ্রে মাছ চাষ: -

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে এবং সুন্দরবনের খাঁড়ি ও নালায় সামুদ্রিক মাছ চাষের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। প্রথাগত নৌকায় সামুদ্রিক মাছ চাষের সীমাবদ্ধতা অনেক। কিন্তু সামুদ্রিক মাছের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়ছে এবং তার জন্য দরকার আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮১-৮২ সাল থেকে রাজ্যের মৎস্যদপ্তর ও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেগুলি হল: -

(ক) নতুন আধুনিক মাছ ধরার নৌকার প্রবর্তন (এন.সি.ডি.সি.) এবং আধুনিক মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেওয়া।

(খ) উপগ্রহের সাহায্যে মাছের ঝাঁক কোথায় আছে নিরূপণ করা।

উপগ্রহের সাহায্যে মাছের ঝাঁকের ছবি তোলা, সমুদ্রে মাছ চাষের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত উপগ্রহকেন্দ্রে।

(চ) বিপণনে সহায়তা: - অন্তর্দেশীয় বাজারে মাছের বিক্রীর জন্য বিভিন্ন সহায়তা যেমন মাছ বিক্রী ও রাখার জন্য শেড, বরফকল, হিমঘর, ঠান্ডা বাহন, বাজারে, দোকানে কিয়স্ক ইত্যাদি।

(ছ) যন্ত্রচালিত নৌকা মেরামতির প্রশিক্ষণ: -

সারা রাজ্যে এই ধরণের তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি এই ধরণের প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে।

এই রকম ছবি তোলা হয় এবং উপগ্রহের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য মৎস্যচাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এছাড়াও রেডিও, দূরদর্শন এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে আবহাওয়া ও অন্যান্য খবর প্রচার করা হয়। সামুদ্রিক ট্রলারে ''ওয়ারলেস ওয়াকিটক'' দেওয়া হয় যার মাধ্যমে ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। এছাড়াও দীঘা (শঙ্করপুর) এবং ফ্রেজারগঞ্জে যোগাযোগ কেন্দ্র তৈরীর কাজ চলছে।

(খ) মৎস্য বন্দর: শঙ্করপুর এবং সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জের রাজ্যের দুটি মৎস্য বন্দর রয়েছে। ১৫০ ভেনেল ও ৫০০-র বেশী যন্ত্রচালিত নৌকা শঙ্করপুর বন্দরে ভিড়তে পারে। ফ্রেজারগঞ্জে প্রায় ২০০ ভেসেল ও ৫০০ নৌকার ব্যবস্থা আছে।

(গ) মাছ ধরার পর মাছ রাখার জায়গা (landing Centres) এর উন্নয়ন।

(ঘ) মাছ দরার ভেসেলগুলির জন্য সমুদ্রে আলোর ব্যবস্থা।

(ঙ) পরিকাঠামোগত সাহায্য: যেমন - মৎস্যবন্দর তৈরী জেটি তৈরী, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, কালভার্ট, ব্রীজ নির্মাণ, কমিউনিটি হল, ট্রেনিং সেন্টার তৈরী ইত্যাদি।

মৎস্যজীবী মানুষদের জন্য কয়েকটি কল্যাণমূলক প্রকল্প: -

(১) মৎস্যজীবীর পরিচয় পত্র: - যে ব্যক্তি মৎস্য শিকার করে এবং বিক্রী করে আয় করেন তিনি এই পরিচয় পত্র পেতে পারেন।

এই পরিচয়পত্র পেতে গেলে আবেদনপত্র পূরণ করে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ সহ জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে।

পরিচয়পত্রটি কেন দরকার: - এটি মৎস্যদপ্তর থেকে নানা সহায়তা লাভে সাহায্য করে। রাত্রিকালীন মাছ ধরার সময়, বিশেষতঃ সীমান্ত এলাকায় কার্ডধারীদের বিপদের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

এছাড়াও দুর্ঘটনাজনিত বীমা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

(২) মৎস্যজীবিদের জন্য বার্ধক্যভাতা: -

৬০বছরের বেশী বয়সের অশক্ত বৃদ্ধ মৎস্যজীবী এই সহায়তা পেতে পারেন। এর জন্য তাকে 'মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ' স্থায়ী সমিতির কাছে আবেদন করতে হবে।

মৎসজীবীদের দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্প: -

কর্মরত অবস্থা কোনো মৎস্যজীবীর প্রাণহানি ঘটলে অথবা স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা ঘটলে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। ৬৫বছর পর্যন্ত মৎস্যজীবীরা এই সুযোগ পাবেন যে মৎস্যজীবীরা এই সুযোগ পাবেন। যে মৎস্যজীবীরা বীমা প্রকল্পের আওতায় এসেছেন সাধারনতঃ সমবায় সমিতির সদস্যরা এই সুযোগ পাবেন। তবে এর জন্য পরিচয়পত্র থাকা দরকার।

(৪) মৎস্যজীবীদের জন্য আদর্শ গ্রাম নির্মাণ।

দরিদ্র মৎসজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতিই হল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ পর্যন্ত এরূপ ৯টি গ্রাম তৈরী হয়েছে।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি: -

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যজীবীদের অবস্থার উন্নতি, জলার ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ চাষ, পরিবেশ দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। গ্রামস্তরে রয়েছে প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতি, জেলাস্তরে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমিতি এবং রাজ্যস্তরে শীর্ষ সমিতি।

যে সব মৎস্যচাষী এইরূপ প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করতে ইচ্ছুক তাদের অন্ততঃ ৩০-৫০একর জলকর থাকার প্রয়োজন। জলকর সদস্যদের নিজস্ব অথবা দীর্ঘমেয়াদী লিজে হতে পারে। জেলার সমবায় সহ রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করে সমবায় সমিতির জন্য আবেদন করতে হবে।

এইভাবে সমবায় সমিতি গঠন করলে যে যে সুবিধা পাওয়া যাবে -

(১) অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষের সুযোগ পাবেন।

(২) প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে।

(৩) সমিতির শেয়ার মূল্যের ৫গুণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শেয়ার পাওয়া যাবে। অবশ্য এর জন্য গত তিন বছরে অডিট রিপোর্ট ও কাগজপত্র জমা দিতে পারে।

(৪) মৎস্য দপ্তরের সব প্রকল্পের আওতায় আসা যাবে।

(৫) জাতীয় সমবায় উন্নয়নের নিগম (NCDC) থেকে নিলে মাছে চাষ করার জন্য বিশেষ সহায়তা।

প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কিছু কর্মসূচি: -

প্রাণী সম্পদ বিভাগের উদ্দেশ্য: -

(১) গ্রামের গরীব মানুষকে স্বনির্ভর করা,

(২) কর্মসংস্থান,

(৩) পশ্চিমবাংলার সম্পদ বাড়ানো,

(৪) বিজ্ঞান ও কারিগীর বিদ্যার আলো গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া,

(৫) প্রাণী চিকিৎসা ও পালন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নতি, অনুসন্ধান গবেষণা ও বিস্তৃতি।

(৬) গ্রামের গরীব মহিলা ও শিশুদের অবস্থা উন্নয়ন।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে এই দপ্তরের কর্মসূচিগুলি হল: -

(ক) প্রাণীর স্বাস্থ্য ও প্রাণী চিকিৎসা: -

(১) ফুট এন্ড মাউথ রোগ নিয়ন্ত্রণ: -

গবাদি পশুর মধ্যে এই রোগের নিয়ন্ত্রণই এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। এর জন্য ৫০% অনুদানে এই রোগের প্রতিষেধক সরবরাহ করা হয়।

(২) জীবনদায়ী ঔষধের সরবরাহ: -

গ্রাম পঞ্চায়েতে নিযুক্ত প্রাণী সম্পদ সহায়করা এই ঔষধ সরবরাহ করার দায়িত্বে থাকেন।

(৩) রোগের নজরদারী।

(৪) কিছু বিশেষ রোগের নিয়ন্ত্রণ।

(৫) রোগ মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলা: -

রাজ্যের নিম্নলিখিত পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাগুলিকে রোগমুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করার কাজ শুরু হয়েছে।

(১) উত্তর ২৪ পরগণার রাজারহাট এবং বারাসাত - ২।

(২) দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগরদ্বীপ ও কাকদ্বীপ।

(৩) নদীয়ার হরিণঘাটা ও চাকদহ।

(৪) হাওড়ার শ্যামপুর - ১।

(৫) পূর্ব মেদিনীপুরের সুতাহাট ১, ২।

(৬) পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী।

(৬) প্রাণী স্বাস্থ্য ক্যাম্প: -

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই প্রাণী স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করেন। এই রকম দুটি ক্যাম্পে হাঁস, মুরগীর টীকা দেওয়া হয়।

(৭) উন্নত জাতের গবাদি পশুর তৈরী: -

কৃত্রিম প্রজননের (AI) সাহায্যে উন্নত প্রজাতির গবাদি পশু তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ ও জিনিসপত্র দেওয়া হয়। ব্লকের প্রানী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণী সহায়ক ও প্রাণী বন্ধুর সাহায্যে তা রূপায়িত হয়।

প্রাণীবন্ধু: -

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যুবক যুবতীকে নির্বাচিত করে রাজ্যের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। এদেরই বলা হচ্ছে প্রাণীবন্ধু। প্রশিক্ষণ শেষে এদের প্রথম কাজ হল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি পরিবারের গবাদি প্রাণী ও হাঁস মুরগী ইত্যাদির পরিসংখ্যান নেওয়া। প্রাণীবন্ধুকে প্রয়োজনীয় সঞ্জারম ও উপকরণ যেমন তরল নাইট্রোজেন, হিমায়িত গোবীজ, স্ট্র ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে। কৃত্রিম প্রজনন ছাড়াও প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রতিষেধক টীকা দেবার কাজ করবেন। এর জন্য তিনি সরকার নির্ধারিত পারিশ্রমিক নেবেন। গ্রামের উদ্যোগী মহিলারা অনায়াসে প্রাণী বন্ধু হতে পারেন।

(৯) মুরগী, ফোয়েল, টার্কি প্রভৃতি খামার তৈরী: -

এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের খামার তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ ও জিনিসপত্র হয়।

(১০) পুরুষ হাঁস, মোরগ বিতরণের মাধ্যমে প্রজাতির উন্নয়ন: -

এই কর্মসূচির আওতায় RIR মোরগ ও খাকি ক্যাম্বেল হাঁস সরবরাহ করা হয়।

(১১) স্থানীয় প্রজাতির সংরক্ষণ ও হাঁস মুরগীর খামার তৈরী। এই কর্মসূচির আওতায় মূলতঃ অর্থ সাহায্য বা হাঁস/ মুরগীর বাচ্চা দেওয়া হয়।

ছাগল/ খরগোশ/ শূকর ইত্যাদি চাষ: -

(১২) ছাগল/ ভেড়া সরবরাহ: - মূলতঃ কিছু অনুদানের সহায়তায় ছাগল/ ভেড়া সরবরাহ করা হয়।

(১৩) ছাগল/ ভেড়ার/ শূকর খামার তৈরী: -

মূলতঃ প্রশিক্ষণ ও অনুদানের সহায়তা পাওয়া যায়।

এছাড়াও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের যে কর্মসূচিগুলি রয়েছে সেগুলি হল: -

খরগোশ পালন কেন্দ্র স্থাপন, পুরুষ, ছাগল, ভেড়া বিতরণ, শুকর খামার তৈরী, পালনে সহায়তা।

এছাড়াও প্রাণী খাদ্য তৈরীর জন্য সুষম খাদ্য তৈরীর কেন্দ্র তৈরী ও গোখাদ্য চাষের জন্য অনুদানভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।

বর্তমানে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে ''পশ্চিমবঙ্গ মহিলা দোহ সমবায় প্রকল্প'' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল্য লক্ষ্য দরিদ্র নারীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য উপযোগী পরিস্থিতি গড়ে তোলা। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের নারী, গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারা এই সমবায়ের সদস্য হতে পারবে, অবশ্য যদি তাদের বয়স ১৮বা তার বেশি হয়। যাদের গাভী নেই। তাদেরকে এস.জি.এস.ওয়াই., এস.সি.পি., টি.এস.পি., ঋণ ও অনুদানের সাহায্যে দুগ্ধবতী গাভী ও সঙ্কর প্রজাতির বকনা বাছুর দেওয়া যেতে পারে। গ্রামীণ নারীদের কাছে স্বনির্ভরতার

সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এস.জি.এস.ওয়াই কর্মসূচির সঙ্গে দোহ সমবায় প্রকল্পের ঘটানো দরকার। স্বনির্ভরদলে আছে ঋণ অনুদানের নিশ্চয়তা, আর দোহ সমবায়ে আছে উৎপন্ন জিনিস বিক্রির নিশ্চয়তা। দোহ সমবায় সমিতির মাধ্যমে দুধ বিক্রয়, গো-প্রজনন ও পশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যাবে।

পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য মিনিকিট ও বীজের সরবরাহ সমিতি থেকে করা হবে। সাধারন সচেতনতা, সমবায় বিষয়ে শিক্ষা গো-পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আয়ের সংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে দোহ সমবায় সমিতিগুলিকে নারী উন্নয়নের বহুমুখী কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

দোহ সমবায় সমিতি গড়তে হলে পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলার প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট উপসমিতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটি, জল ও প্রাণীসম্পদ বিকাশের ব্যবস্থাপনা: -

১) বনভূমি ও অরণ্য সংরক্ষণ এবং তার সঙ্গে সামাজিক বনসৃজনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া [পঞ্চায়েতে আইন, ধারা ২০(১)]।

২) বন্যা রোধের জন্য বিশেষ করে নদীপথের উচ্চ অববাহিকায় বনসৃজন।

৩) জলবিভাজিকা এলাকার উন্নয়ন ও সেখানে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ [ধারা ১৯]।

৪) জলের সুষ্ঠ ব্যবহার ও বন্টন এবং জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ এবং ঐ জলাভূমিতে মৎস্যচাষ।

৫) কৃষিজ ও প্রাণীজ বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা এবং ঐ দ্রব্যসামগ্রীর পুনরাবর্তন, চক্রায়ন ও পুননবীকরণের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমানো।

৬) কৃষিক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের (মাটি,জল,গাছপালা) সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে স্থানীয় এলাকায় প্রচারের মাধ্যমে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করা [ধারা ১৬ (ক) (৬) (ডি)]।

৭) প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কৃষি, প্রানীপালন, স্বাস্থ্যরক্ষণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর যোগসাধন। টেকসই কৃষি ব্যবস্থার জন্য সম্পদে অধিকার (জমির মালিকানা) এবং সেই সঙ্গে ভূমি-সংস্কার একান্ত প্রয়োজন [ধারা - ২০ (এন)]।

৮) প্রাকৃতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে মধ্যে অসমতা হ্রাসকরণ।

৯) বনজঙ্গল ও গাছপালার উপর জ্বালানীর চাপ কমানোর জন্য গ্রামাঞ্চলে ধোঁয়াহীন চুল্লীর ব্যাপক ব্যবহার।

১০) গ্রামাঞ্চলের বিপজ্জনক ও সংকটজনক ব্যবসা যেমন ইটভাটা, টালিভাটা, রঙের কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতির জন্য কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব রুখতে পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আরোগ সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান।

১১) মাটি সংরক্ষণের জন্য এস.জি.আর.ওয়াই কর্মসূচীতে বৃষ্টি ও জলপ্রবাহে ধুঁয়ে যাওয়া মাটি জমানোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বেছে মাটি অধক্ষেপ বা পলি আটক পুকুর খনন। পতিত জমি উদ্ধার করে চাষযোগ্য করার কর্মসূচী গ্রহণ [ধারা ১৯ (১) (জি) ২০ জে, ২০ (এল)]।

১২) ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য বৃক্ষরোপন, পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ ও চারণক্ষেত্র তৈরী করা, ঢালু জমিতে ধাপ চাষ। জৈব সার তৈরি করার জন্য পঞ্চায়েত জায়গা বরাদ্দ করতে পারে [২১ (এফ)] এলাকাগত ভূমি/মাটি সমীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল চাষীদের জানিয়ে সচেতন করা। কৃষিকার্যে শস্যাবর্তন ও শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ মাটিতে নাইট্রোজেন বাড়াতে পারে - এ ব্যাপারে চাষীদের উৎসাহ দেওয়া।

১৩) জলদূষন রোধের জন্য বিভিন্ন বাড়ির পরিত্যক্ত জল, নর্মদার ধোয়ানো জল, যাতে সাধারণের ব্যবহার্য পুকুরে না মেশে তার ব্যবস্থা করা। বাড়িঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমোদনের সময়ে এর ব্যবস্থা করতে পারে [ধারে ২৩, ২৪, ২৬, ২৭]।

১৪) দূষনরোধ করা এবং পুননবীকরন যোগ্য শক্তি যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈব গ্যাস উদ্ভূত শক্তি প্রভৃতি অপ্রচলিত শক্তি উৎস থেকে শক্তির ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর জন্য কর্মসূচী গ্রহণ [ধারা ২০ (টি)]।

১৫) কৃষির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত স্থানীয় হস্তশিল্প, পরিষেবা ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রসার। সমবায় উদ্যোগের যথাসম্ভব প্রসার ঘটানো।

১৬) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য দপ্তর প্রভৃতির কাজের মধ্যে সার্থক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

১৭) উৎসাহ দেওয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষিমেলার ব্যবস্থা করা যেখানে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে নিজেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি বুঝতে পারে। উৎপাদনের উৎকৃষ্টতা অনুযায়ী পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা। বছরে অন্তত একবার ‘কৃষক দিবস পালনের’ মাধ্যমে জমায়েত করা যেখানে চাষীরা তাদের জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে পারে এবং নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।